দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

17

বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিঃএ্যান্ড টেকনোলজি ॥ ছাত্রদের ভবিষ্যত

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারিগরি শিক্ষাই ছাত্র ও অভিভাবক এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের নিকট সমাদৃত। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হলে বাবা-মায়েরা তাদের সন্তান নিয়ে স্থান বিশেষে গর্ব করার সুযোগ পান। আবার পাড়া প্রতিবেশীরাও এই ছেলেটি বা মেয়েটিকে সুনজরে দেখে। সরকারও প্রচুর টাকা খরচ করে এ ধরনের একজন ছাত্রের পিছনে।

একজন ছাত্র মেডিক্যালে বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়তে চাইলে প্রথমেই তার প্রয়োজন হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে অর্জিত একটি সুন্দর রেজাল্ট, যাতে সে মেডিক্যালে বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলোতে অপর্যাপ্ত আসনের জন্য একটি সীটের বিপরীতে ১০-১২ জনের মতো ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ফলে সব ছাত্রই তার পছন্দের বিষয়ে পড়ার সুযোগ পায় না। আমার জানামতে, একজন স্ট্যান্ড করা ছাত্রী পরপর দু'বার মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েও টিকতে পারেনি অথচ সে বুয়েটে প্রথম চান্সেই টিকে গেছেন। আবার মেডিক্যালে চান্স পাওয়া অনেক ছাত্রছাত্রী বুয়েটে ভর্তি হওয়ার আশা করতে বা করে। অথচ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা বহু ছাত্রছাত্রী বেকার অবস্থায় আছে। বেশ কিছুদিন পূর্বে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, চাকরি ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২ ভাগ, বুয়েটের ৯ ভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ ভাগ এবং বাকি ৫০ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ পাচ্ছে। অর্থাৎ বাদ বাকি ছাত্রছাত্রী বেকার। অন্য একটি দৈনিকে ছাপা হয় যে মেডিক্যালের ১৬ ভাগ ছাত্রছাত্রীই সরকারী চাকরি পায়। বুয়েট এবং বিআইটির কম্পিউটার ইঞ্জিঃ এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিঃ-এর ছাত্ররা চাকরি অন্যান্যদের চেয়ে বেশি পায়। তবে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা আল্লাহর রহমতে বেকারত্বের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত। আমার জানামতে কোন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বেকার নেই। যাঁরা চিন্তা করেন যে, ফাইন্যাল পরীক্ষার পর মাসেই চাকরিতে জয়েন করবেন তাঁরা ইচ্ছা করলেই তা করতে পারেন। রেজাল্টের অপেক্ষা না করে অনেকেই তা করছেন। বেতনও পাচ্ছেন ভালই। অনেকের কাছে গল্পের মতো শুনালেও তা সত্যি।

১৯৩৯ সালে বর্তমান 'বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিঃ এ্যান্ড টেকনোলজি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট' হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর মূল ভবনই তখন এ কলেজের মূল ভবন ছিল। পরবর্তীতে সরকার পলিটেকনিককে টেক্সটাইল কলেজের মূল ভবনে স্থাপিত করে। আর টেক্সটাইল কলেজকে এরই উত্তর পাশে একটি নতুন ভবন তৈরি করে উক্ত নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করে, যা বর্তমানে কলেজের মূল ক্যাম্পাস। এ প্রতিষ্ঠানে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং চালু হয় ১৯৭৮ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর একাডেমিক দিক পরিচালনা করে। অবশ্য দুঃখজনক হলেও সত্যি, এ কলেজের স্বায়ত্তশাসন নেই। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর-এর প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কলেজের অবস্থা দুঃখজনক। মূল ভবনে কবে চুনকাম হয়েছিল তা আল্লাহই জানে! টয়লেটে সবসময় পানি থাকে না। সবচেয়ে অসুবিধা দেখা দেয় ক্যান্টিন নিয়ে। একটি ক্যান্টিন এক সময় চালু করলেও আশপাশের কলেজের এক শ্রেণীর ছেলেদের উৎপাতের কারণে তা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ওয়ার্কশপের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অপর্যাপ্ত। ব্লাক বোর্ড নষ্ট, টেবিল চেয়ার পুরনো ধাঁচের। এ সমস্ত অভিযোগ সকল ছাত্রের। তারপরও এ কলেজে ছাত্ররা পড়ছে এবং পড়বে। কারণ বর্তমান বেকারত্বের যুগে পাস করা এসব ছাত্রের বেকারত্বের অভিশাপ বহন করতে হয়নি। মেয়েদের জন্যও টেক্সটাইলের কর্মক্ষেত্র অনেক ভাল। যারা মিলে কাজ করতে পারে তাদের কোন সমস্যাই নেই। তবে মিলে কাজ কিছুটা কষ্টসাধ্য বলে অনেকে ব্যাংকে (পৃথক পদ আছে) চাকরি নেয়। আবার অনেকে ল্যাবেও কাজ করে। ছাত্রীনিবাস না থাকার কথা বলা হলেও এক ছাত্রীর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ ১০-১২ জন ছাত্রীকে টিচার্স কোয়ার্টারের এক অংশে রাখার ব্যবস্থা নিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে মাস্টার্স করার জন্য টেক্সটাইলের গ্রাজুয়েট করা ছাত্রদের কোন ব্যবস্থা নেই। মাস্টার্স করার জন্য ছাত্রদেরকে যেতে হয় ভারত, ইংল্যান্ড বা আমেরিকাতে। সরকার ইচ্ছা করলে ঢাকা ভার্সিটির অধীনে মাস্টার্স চালু করতে পারে। কলেজের দুরবস্থা ও বর্তমান সঙ্কট নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এগিয়ে আসা উচিত।

সংবাদদাতার